দেবনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলিল—জমিদারের কথা বাদ দেন। জমিদার আমাদের খারাপ কিসের? এ কাজ তো জমিদারের নয়—আপনাদের। আপনারা কই শক্ত হয়ে বসে ডাকুন দেখি মজলিস। ঘাড় হেঁট করে সবাইকে আসতে হবে। আসবে না—চালাকি নাকি? বিপদ-আপদ কি নাই তাদের? লোহাতে মুড় বাঁধিয়ে ঘর করে সব? চৌধুরীকে ডাকুন—জগন ডাক্তারকে ডাকুন—ডেকে আগে ঘর বুঝুন। তারপর, কামার, ছুতোর, বায়েন, দাই, ধোপা, নাপিত এদের ডাকুন; আর ন্যায্য বিচার করুন। তাদের পাওনাটা কড়ায়-গণ্ডায় পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হরিশ মাতব্বরদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এ দেবনাথ কিন্তু বলেছে ভাল। কি বলেন গো সব?

ভবেশ বলিল—উত্তম কথা।

নটবর বলিল—হ্যাঁ, তাই করুন তা হলে।

দেবনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না, সে বলিল—আজই বসুন সব সন্ধ্যের সময়। আমি আসর ক'রে দিচ্ছি, স্কুলের চল্লিশ বাতির আলো দিচ্ছি; খবরও দিচ্ছি সকলকে। কি বলছেন সব?

হরিশ আবার সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি গো?

—তা বেশ। খানিকটা তামাক আর আগুনের যোগাড় রেখো বাপু।

* * *

বহুকাল পর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালাটা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনি ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত সংকীর্তন হইত, পাশা-বাবাও চলিত; গ্রামখানির সলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব-সজ্জন আসিলে—এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া-কর্ম—অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সবই এইখানে অনুষ্ঠিত হইত। কালগতিকে ধূলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না। জগন ডাক্তারের পূর্বপুরুষ—জগনের পিতামহই কবিরাজ হইয়া বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানার পত্তন করিয়াছিল। প্রথমে সে অবশ্য এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই রোগী দেখিত। তারপর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যেও বটে এবং জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে কি

ব্যারেল করিয়া দেওয়াই বা এমন কি কঠিন? শ্রীহরিরও মিতে আছে। মিতে গড়াঞী সানন্দে তাহাকে সাহায্য করিবে।

পরক্ষণেই সে চম্‌কিয়া উঠিল। ধরা পড়িলে ফাঁসী হইয়া যাইবে। তাহার সে চমক এত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট যে তাহার ক্ষীণদৃষ্টি বুড়ী মা পর্যন্ত দেখিয়া ফেলিল। অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সে বলিল—মর্ মুখপোড়া! ছোট ছেলের মত চমকে উঠে যেন দেয়ালা ক'রেছে!

শ্রীহরি অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া হুঁকা হইতে কল্কেটা নামাইয়া দিয়া বলিল—এই! শুনচিস্? কল্কেটা পাল্টে দিয়ে যা।

কথাটা বলা হইল তাহার স্ত্রীকে। ছিরুর স্ত্রী রন্ধনশালে ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। পাশেই ল্যাম্পের আলোয় ছিরুর বড় ছেলেটা বই খুলিয়া একদৃষ্টে বাপের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। শীর্ণ, রুগ্ন, বছর দশেকের ছেলেটা—গলায় এক বোঝা মাদুলী—বড় বড় চোখে অদ্ভুত স্থির মূঢ় দৃষ্টি। চিন্তাগ্রস্ত বাপের প্রতিটি ভঙ্গিমা সে লক্ষ্য করিতেছে। শ্রীহরির ছোট ছেলেটা প্রায় পঙ্গু এবং বোবা; সেটাও একপাশে বসিয়া আছে—মুখের লালায় সমস্ত বুকটা অনবরত ভিজিতেছে। বড় ছেলেটি উঠিয়া আসিয়া কল্কেটা লইয়া গেল। শ্রীহরি ছেলেটার দিকে একবার চাহিল। ছেলেটা অদ্ভুত, শ্রীহরির মার খাইয়াও কাঁদে না, স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ছেলেটার জন্য এখন তাহার মাকে প্রহার করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মাকে যেন আগলাইয়া ফেরে। মারিলে পশুর মত হিংস্র হইয়া উঠে। সেদিন সে প্রহাররত শ্রীহরির পিঠে একটা শুচ বিঁধাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্রীহরি স্ত্রীর দিকে চাহিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণ মুখখানা উনানের আগুনের আভায় লাল হইয়া উঠিয়াছে—চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালসার মুখ! শ্রীহরি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

—'হ্যাঁ, আর এক উপায় আছে! অনিরুদ্ধর অনুপস্থিতিতে পাঁচিল ডিঙাইয়া পদ্ম কামারনীকে বাঘের মত মুখে করিয়া'—। শ্রীহরির বুকখানা ধ্বক ধ্বক্ করিয়া লাফাইতে লাগিল। দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা কিন্তু বড় শাণিত! চোখের দৃষ্টি তাহার শীতল এবং ক্রূর। সেদিন দা-খানার রৌদ্র প্রতিফলিত ছটায় ছিরুর চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল।

বায়েনদের দুর্গা—কামারনীর চেয়ে দেখিতে অনেক শ্রী। যৌবন তাহার উচ্ছ্বসিত; দেহবর্ণে সে গৌরী; রঙ্গরসে, লীলা-লাস্যে সে অপরূপা। কিন্তু সে বহুভোগ্যা, সেই কারণেই তাহার আকর্ষণ শ্রীহরিকে আর তেমন

বিচলিত করে না। দুর্গার দাদা পাতু আবার তাহার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করিয়াছে। স্পর্ধা দেখ বারেনের! শ্রীহরির মুখে তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জমিদারের ছেলের সোনার নিমফলের গোট তাহার কাছে বন্ধক আছে। অকস্মাৎ শ্রীহরি উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীহরির স্ত্রী কল্কেতে নতুন তামাক সাজিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কিন্তু তামাক শ্রীহরিকে আর আকর্ষণ করিল না। দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলানো জামাটা হইতে বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। অন্ধকার গলি-পথে-পথে ঘুরিয়া সে হরিজন-পল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। পল্লীর প্রান্তে বহুকালের বৃদ্ধ বকুলগাছ, গ্রামের ধর্মরাজতলা—সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় উহাদের মজলিস বসে। গান-বাজনা হয়, ভাসান, বোলান, ঘেঁটু-গানের মহলা চলে—আবার এক-একদিন দুর্নিবার কলহও বাধিয়া উঠে। আজ কলহ বাধিয়াছে। শ্রীহরি একটা গাছের অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে আরম্ভ করিল।

পাতু বাইনই আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতেছে।

দুর্গারও তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের আওয়াজ উঠিতেছে—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই। দাদা সাজছে, দা-দা! মারবি ক্যানে তু! আমার যা খুসি আমি তাই ক'রব। হাজার নোক আসবে আমার ঘরে, তোর কি? তোর ভাত আমি খাই?

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার মা-ও চীৎকার করিতেছে। শ্রীহরি হাসিল,—ওঃ। এযে তাহাকে লইয়াই আন্দোলন চলিতেছে!

সহসা একটা মতলব তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল দুর্গাদের বাড়ীর দিকে। বকুল গাছটার ওপাশে পল্লীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। মেয়ে পুরুষ সব গিয়া জুটিয়াছে ওই গাছতলায়। শ্রীহরি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িল দুর্গাদের বাড়ীতে। বাড়ী অর্থে প্রাচীরবেষ্টনহীন এক টুকরা উঠানের দুই দিকে দু'খানা ঘর; একখানা দুর্গা ও দুর্গার মায়ের, অপরখানা পাতুর। শ্রীহরির তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাতুর ঘরখানার দিকে। শ্রীহরি হতাশ হইল। দরজাটা বন্ধ—দাওয়াটাও শূন্য।

একটা কুকুর অকস্মাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বোধ হয় চুরি করিয়া কাঁচা চামড়ার টুকরা খাইতে আসিয়াছিল। শ্রীহরি হাসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, সুকৌশলে হাতের মধ্যে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে লুকাইয়া টানিতে

ঘরগুলি ধ্বসিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে জ্বালানির জন্ত সংগৃহীত শুকনা পাতায় তামাকের আগুন ও জলন্ত বিড়ির টুকরা ফেলিয়া মত্তবিভোর নিশীথে নিজেরাই ঘরে আগুন লাগাইয়া ফেলে। সব বিপর্যয়ের পর সংসার গুছাইবার শিক্ষা এমনই করিয়া পুরুষানুক্রমেই ইহাদের হইয়া আসিতেছে। ঘর-দুয়ার পরিষ্কারের পর আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত সন্ধ্যার বাসি ভাতই ইহাদের সকালের খাদ্য, ছোট ছেলেদের মুড়ি দেওয়া হয়; কিন্তু ভাত বা মুড়ি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছোট বাচ্চাগুলা ইহারই মধ্যে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু তাহার আর উপায় নাই। দুই-একজন মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলার পিঠে দুম-দাম করিয়া কিল-চড় বসাইয়া দিল।—রাক্ষসদের প্যাটে যেন আগুন লেগেছে। মর মর তোরা, মর।

ঘরদুয়ার পরিষ্কার হইয়া গেলে মনিব-বাড়ী যাইতে হইবে—তবে আহার্যের ব্যবস্থা হইবে। মনিবেরা এসব ক্ষেত্রে চিরকালই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ পাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে বাঁধা বাৎসরিক, বেতনে বা উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। কেহ কেহ পেট-ভাতায় বা মাসে ভাতের হিসাব মত ধান লইয়া থাকে এবং ছোটগুলা পেটভাতায় বৎসরে চারখানা সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আট আনা হইতে এক টাকা পর্যন্ত মাহিনা পায়—ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়—ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ-সমেত ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত। অজন্মার বৎসরের এই ঋণ শোধ না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়া তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এই প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু ইহারা বোধ করে না—বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের ভাবই অন্তরে ইহার জন্ত পোষণ করে। দায় দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন—সেইটাই অতিরিক্ত করুণা। সেই করুণার ভরসাতেই আহার্যের চিন্তায় এখন তাহারা খুব ব্যাকুল নয়। মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষী-গৃহস্থের ঘরে সকালে-বিকালে বাসন মাজে, আবর্জনা ফেলিয়া পাট-কাম করে। মেয়েরাও সেখান হইতে কিছু কিছু পাইবে। এ ছাড়া দুধের দাম কিছু কিছু পাওনা আছে। সে পাওনা কিন্তু গ্রামে নয়। চাষীর গ্রামে চাষীদের ঘরেই দুধ হয়। হরিজনেরা তাদের গরুর দুধ পাশের বড়লোকের গ্রাম কঙ্কণায় গিয়া বেচিয়া আসে। ঘুঁটেও সেখানে বিক্রয় হয়। কেহ কেহ জংসনে যায়।

পাতুর কিন্তু এসব ভরসা নাই। সে জাতিতে বায়েন বা বাদ্যকর অর্থাৎ মুচি। তাহার কিছু চাকরান জমি আছে। গ্রামের সরকারী শিবতলা, কালীতলা এবং পাশের গ্রামের চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজায়। সেই হেতু বৎসরে দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পিতামহদের আমল হইতে পাইয়া আসিতেছে। নিজের দুইটা হেলে বলদ আছে—তাই দিয়া সে নিজের জমির সঙ্গে ঐ কঙ্কণার ভদ্রলোকের কিছু জমিও ভাগে চাষ করিয়া থাকে। এ ছাড়া ভাগাড়ের মরা গরু-মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া পূর্বে সে চামড়া-ব্যবসায়ী সেখদের বিক্রয় করিত। আপদে-বিপদে তাহারাই দু'চারি টাকা দাদন-স্বরূপ দিত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করায় এ দিকের আয় তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। নেহাৎ পারিশ্রমিক অর্থাৎ তিন-চার আনা মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া চামড়াওয়ালার সঙ্গে মনান্তরও হইয়াছে। সে কি আর এ সময় সাহায্য করিবে? যে ভদ্র লোকের জমি ভাগে চাষ করে, সে কিছু দিলেও দিতে পারে; কিন্তু ভদ্রলোক খৎ না লেখাইয়া কিছু দিবে না। সেও অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। খৎকে পাতুর বড় ভয়। শেষ পর্যন্ত নালিশ করিয়া বাড়ীটা লইয়া বসিলে সে যাইবে কোথায়? পৃথিবীর মধ্যে তাহার সম্পত্তি এই বাড়ীটুকু।

আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে পাতু দ্রুত গতিতে ছাই জড় করিয়া চলিয়াছিল। ছিরুপালের কাছে সেদিন মার খাইয়া তাহার মনে যে উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে উত্তেজনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে উত্তেজনাবশেই সেদিন অমরকুণ্ডার মাঠে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে ছিরুপাল সম্পর্কে আপনার সহোদরা দুর্গার যে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া নালিশ করিয়াছিল তাই লইয়াই গত সন্ধ্যায় স্বজাতির মধ্যে তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইয়াছে। স্বজাতিরা কথাটা লইয়া ঘোঁট পাকাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমি তো আপন মুখেই এই কেলেঙ্কারীর কথা চৌধুরী মশায়ের কাছে বলেছ, জমিদারের কাছারীতে বলেছ। বলেছ কি না?

—হ্যাঁ, বলেছি!

—তবে? তুমি পতিত হবে না কেন, তা বল?

কথাটা পাতুর ইহার পূর্বে ঠিক খেয়াল হয় নাই। সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হন হন করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়া দুর্গার চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে মজলিসের সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। ধাক্কা দিয়া দুর্গাকে মাটির উপরে ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—